জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে বাঙালি নারী

মোছা. রূপালী খাতুন*

Abstract

The swadeshi and the non-cooperation movement were initiated in 1905 throughout India in the aftermath of the Partition of Bengal. The male-dominated political leadership called upon the women to take part in the movement with the thought that the women can lead the way by using the indigenous products and boycotting the foreign imported ingredients in the day to day house-hold activities. The Bengali women also spontaneously took part in the anti-British movement in the hope of liberty as they were blocked inside for long in the patriarchal society. They advocated for using indigenous products in daily house-hold affairs, spinning the Charka to make yarn and weave cloths out of them, picketed in front of shops that sell imported products, took part in meetings and societies, as well as tried to inspire people in swadeshi thoughts by writing in contemporary periodicals. Taking part in this movement encouraged the Bengali women and made the foundation of their self-development, which was one of the big step of women-awakening. This paper is prepared completely following the Analytical Research Method.

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে জাতীয় আন্দোলনে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এক মাইলফলক। এ আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয় স্বদেশি[১] ও বয়কট[২] আন্দোলন। স্বদেশি আদর্শে উদ্বুদ্ধ এ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিকরণ। আন্দোলনের কৌশলের অন্তর্গত ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটিয়ে সর্বত্র স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার শুরু করা। এ আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি নারী পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বন্দি নারী-সমাজের বৃহৎ অংশ এই প্রথমবারের মতো জাতীয় দুর্যোগে এগিয়ে আসেন। তৎকালে পরিবারের পুরুষসমাজ উপলব্ধি করেন সমাজের অর্ধাংশ নারীকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সফলতা লাভ সম্ভবপর হবে না। তাই তারা মেয়েদেরকে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। সমাজের কাছে মানুষ হিসেবে নিজেদের গুরুত্ব প্রকাশ পাওয়ায় বাংলার নারী-সমাজ এ আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া দেন।[৩] পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে তারা রাজনৈতিক সচেতনতা ও বলিষ্ঠতার প্রমাণ দেন। মূলত স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যা নারীমুক্তি আন্দোলনের নামান্তর। তবে এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা অনেকাংশে এর স্বীকৃতিতে অদৃশ্য থেকে গেছেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের কারণ, অংশগ্রহণের ধরন এবং সর্বোপরি তাদের ভূমিকা কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও আত্মজীবনী প্রাথমিক উৎস হিসেবে এবং আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাবলী দ্বৈতিয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উল্লেখ্য প্রবন্ধটি রচনায় মানবিকবিদ্যা গবেষণাক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান এ দুটি রীতিই অনুসরণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এখানে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্য হলো কিভাবে বাঙালি নারীসমাজ দীর্ঘদিনের অবরোধপ্রথার অচলায়তন ভেঙে রাজনীতি সচেতন হয়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয় তা বিশ্লেষণ করা। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি নারীর সচেতনতভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া এবং তাদের অগ্রযাত্রার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা। অন্যদিকে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে অসংখ্য নারীর বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের তথ্য প্রকাশও আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিকভাবে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বাঙালি নারীর রাজনীতি সচেতনতা ও সংগ্রামী জীবনের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বৈদিক যুগে লোপা ও গার্গী যোদ্ধা নারী ছিলেন। ঋকবেদ থেকে জানা যায় মৃদুগালিনী যুদ্ধ জয় করেন, এক যুদ্ধে বিশপলার একটি পা এবং বধ্রিমতির হাত কাটা যায়। অন্য একজন নারী শশিয়সী বীরাঙ্গনা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কর্টিয়াস নামক রোমান লেখক মেসেনা অবরোধের সময় যুদ্ধরত ভারতীয় নারীর কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন।[৪] খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যোদ্ধা নারী শক্তিকীর নাম পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সুলতানি আমলে (মুসলিম শাসনামল) সুলতান রাজিয়া (১২০৫-১২৪০) পুরুষের পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি হাতে শত্রুদের মোকাবেলা করেন। মুঘল আমলে রানী যুধাবাঈ, রানী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা (১৫৫০-১৫৯৯), হামিদা বানু (১৫২৭-১৬০৪), মাহাম আনগা (মৃত্যু-১৫৬২), সম্রাজ্ঞী নূরজাহান (১৫৭৭-১৬৪৫), মমতাজ মহল (১৫৯৩-১৬৩১), শাহজাদী জাহান আরা (১৬১৪-১৬৮১) ও রওশন আরা (১৬১৭-১৬৭১), জীজাবাঈ, তারাবাঈ এবং মীরাবাঈ রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[৫] ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায় রাজস্ব সংগ্রহের বিরুদ্ধে পরিচালিত ফকির-সন্ন্যাসী দলটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গঠিত ছিল।[৬] উল্লেখ্য এ বিদ্রোহের একজন নেতা হিসেবে দেবী চৌধুরাণীর নাম পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে চোয়াড়[৭] বিদ্রোহে নিম্ন আয়ের পরিবারের মেয়েদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা জানা যায়। আবার তিতুমীরের বিদ্রোহে তাঁর মা আয়েশা বেগম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৮] ফরায়েজি আন্দোলনের সময় হাজী শরীয়ত উল্লাহর স্ত্রী মেয়েদেরকে সংগঠিত করার কাজ করেন। অন্যদিকে নীল বিদ্রোহের সময় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় দক্ষিণ ভারতের গঙ্গাবাঈ (মাতাজী মহারানী), ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁর সহচরী মোতিবাঈ, কিট্টুরের রানী চেন্নামা এবং সাধারণ মেয়েরা হাতে অস্ত্র তুলে নেন।[৯] সিপাহী বিদ্রোহে মুসলিম নারী হযরত মহল বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।[১০]

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙালি নারীকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে। এ সময় নারীসমাজ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ হতে ভারতবর্ষের মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ প্রতিনিধি Lord Ripon (১৮২৭-১৯০৯) এর আইন পরিষদের সদস্য Sir Courtenary Peregine Ilbert (১৮৪১-১৯২৪) একটি বিল উত্থাপন করলে এর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে একটি আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন বেথুন কলেজের ছাত্রী কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), অবলা বসু (১৮৬৬-১৯৫১) এবং সরলাদেবী (১৮৭২-১৯৪৫) ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছাত্রীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৮৮৫ সালে হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান *All India National Congress* গঠিত হলে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী এ সংগঠনে যোগদান করেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের

চতুর্থ অধিবেশনে দশজন মহিলা ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন। এ সকল নারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, পণ্ডিত রামাবাঈ, শেবন্তীবাঈ ত্রিম্বক, শান্তাবাঈ নিকাম্বো, কাশীবাঈ কানিতকর, মানেকজী, কারমেতজী প্রমুখ।[১১] উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে *All India National Congress* এর অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।[১২]

বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) অব্যবহিত পূর্বকালে বাঙালি মেয়েদের নানারকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) এবং তাঁর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৬) প্রধান ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে সরলাদেবী এদেশের নারী জাগরণের জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় ও কার্যক্রমে নারী জাতির সম্মুখে এক দীপ্ত আদর্শরূপে ফুটে উঠেছে এবং সে আদর্শ অনুসরণ করে বাংলার বালিকা, যুবতী এমনকি প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারা পর্যন্ত জেগে উঠেছেন।[১৩] সরলাদেবী তৎকালীন প্রভাবশালী *ভারতী পত্রিকা* (প্রকাশকাল ১৮৯৫) সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকার মূলমন্ত্র ছিল দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।[১৪] তিনি নানাভাবে নারীর আত্মশক্তি অর্জনের অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য 'অন্তরঙ্গ' নামক একটি নারীদল গঠন করেন। উল্লেখ্য ১৯০০ সালে সরলাদেবী বাঙালি যুবক ও যুবতীদের জন্য লাঠিখেলা, তলোয়ার চালানো, কুস্তি লড়াই, শরীরচর্চার নানা কৌশল প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে মেয়েদের খুব বেশি সাড়া না পাওয়া গেলেও তরুণ সমাজের এ শিক্ষার প্রতি ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। অন্যদিকে সরলাদেবী সংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমের মন্ত্রে নারী-পুরুষকে উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন। তাঁর রচিত 'নমো হিন্দুস্তান' শীর্ষক গানটি ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের এক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।[১৫] বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য মারাঠিদের 'শিবাজি উৎসব' এর অনুকরণে তিনি ১৯০৩ সালে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'[১৬] উদযাপন করেন। এ উৎসবে তরুণরা মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার পরিচালনা প্রভৃতি খেলায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। ১৯০৪ সালে তিনি বাংলার যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি জাগ্রত করার লক্ষ্যে 'বীরাষ্টমী ব্রত' উদযাপন করেন।[১৭] এ উপলক্ষে তিনি বীরাষ্টমী গানও রচনা করেন। সরলাদেবী 'বঙের বীর' সিরিজের কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা চালাতেন। আবার তিনি 'উদয়াদিত্য উৎসব' পালন করেন। এ উৎসবে মঞ্চে একটি তরবারি রেখে বীরযোদ্ধা উদয়াদিত্যকে (রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র) স্মরণ করে ঐ তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হতো।[১৮] মূলত এসকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে দেশীয়দের শক্তির বৃদ্ধি ঘটানো।

সরলাদেবী স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করার প্রচারণার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা স্বদেশি বস্ত্র ও নানা জিনিসপত্রের দোকান। উল্লেখ্য শুধু মেয়েদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র লক্ষ্মীভাণ্ডারে পাওয়া যেত।[১৯] সরলাদেবী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন মিলে কলকাতার বৌবাজারে 'Swadeshi Stores' নামক আরেকটি স্বদেশি জিনিসের দোকান পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে সরলাদেবী লিখেছেন যে, "আমার ও যোগেশ বাবুর স্বদেশি প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল"।[২০] উল্লেখ্য সরলাদেবী সারাজীবন স্বদেশি পোশাকে সজ্জিত থেকেছেন। তিনি ১৯০৫ সালে *ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির* 'প্রতাপাদিত্য ব্রত'র দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং এ অধিবেশনে সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্' গানটি সামান্য পরিবর্তন করে সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে শোনান। এসময় মহারাষ্ট্রের 'ভবানী পূজা'র ন্যায় সুহৃদ সমিতিতে কালীপূজার প্রচলন করেন এবং প্রচার করেন যে, কোনো শত্রুর হাত থেকে দেবী কালী দেশকে রক্ষা করবে। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিপিনচন্দ্র পালের সাথে *Bengal Party* নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।[২১] উল্লেখ্য এ বছরই (১৯০৫) পাঞ্জাবের আর্য সমাজের নেতা পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সাথে সরলাদেবীর বিবাহ হলে তিনি স্বামীর সাথে পাঞ্জাবে চলে যান। ফলে বোম্বাই ও উত্তর ভারতে তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তিনি পরবর্তীকালে ১৯১০ সালে 'ভারত

মহামণ্ডল' গঠন করেন, যার শাখা বাংলাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২] সরলাদেবী সমসাময়িক নারীর প্রেরণার উৎস ছিলেন। তাই স্বদেশি আন্দোলনে তাঁর আদর্শ ও কার্যক্রমের প্রভাব বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে এর বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে। বিদেশি পণ্য বর্জন তথা বয়কট, বিদেশি পণ্য বর্জনে জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা, দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার, এ লক্ষে দেশি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বতোভাবে আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য সর্বস্তরের নারীর সহযোগিতা তথা সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। ফলে এ আন্দোলনে প্রধানত পুরুষসমাজ অংশগ্রহণ করলেও বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও দেখাশোনা, সংবাদ ও অস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি কাজে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ-শাসন বর্জন ও বিলেতি পণ্য বয়কট করে স্বরাজ লাভের জন্য ভারতবর্ষে সর্বত্র স্বদেশি পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য পরিচালিত এ আন্দোলনে নারীসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্বারা পরিচালিত, তাই এখানে শুধু মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েরা প্রথমাবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলন সম্পর্কে আশালতা সেন বলেন,

> আমার শৈশবের সবচেয়ে স্পষ্ট স্মৃতি হচ্ছে ইংরেজি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও লেখনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গান আর ক্ষুদিরাম, কানাইলালের পিস্তলের গুলি সমস্ত দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। .... বিদেশি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা, মিছিল, ধর্মঘট, বিদেশি জিনিস বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন ব্যাপকভাবে চালান, যার সাথে পরবর্তী কালের গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধ পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। ... ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের অর্ধ শতাব্দী পরে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনই সবচেয়ে বড় ইংরেজ বিরোধী দেশব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা।[২৩]

বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রথম আহ্বান জানিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রতধারণ' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[২৪] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাকে দেবী দুর্গার সাথে তুলনা করে একটি সংগীত রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন মেয়েদের কাছে এ বছরের ভাই ফোটার খরচ বাঁচিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত জাতীয় তহবিলে অর্থ দানের আহ্বান জানান। তাই মেয়েরা রাখি কেনার টাকা বাঁচিয়ে জাতীয় ভাণ্ডারে সে অর্থ প্রদান করেন। পাশাপাশি তারা ঘরে বসে নিজেদের মতো করে রাখি তৈরি করে নেন, যা এ আন্দোলনের সফল পদক্ষেপ। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিত্রকলায় ভারতকে 'ভারতমাতা' রূপে চিত্রিত করেন। এ সময় আন্দোলনকারীরা দেশকে দুর্গা ও কালী দেবীর সাথে কল্পনা করায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটে, যে কারণে মুসলমানরা স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্বদেশি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন।[২৫] এখানে ধর্মীয় আবরণে নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক করণীয় স্পষ্ট করা হয়। আবার *ভারত মহিলা* পত্রিকায় (১৯০৫ সালে প্রকাশিত) প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে, 'রাজনীতি হউক আর শিল্পবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষের শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না'।[২৬] উল্লেখ্য এ সংখ্যাতে কুমুদিনী মিত্র 'মাতৃভূমির দুর্দিনে মহিলাগণের কর্ত্তব্য' শিরোনামে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে নারীকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।[২৭] এভাবে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে তথা সর্বস্তরের নারীকে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। এ সময় 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতির সাথে যুক্ত থেকে বাঙালি নারী স্বদেশি শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে সক্রিয় থেকে আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[২৮] উল্লেখ্য

স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, নির্ঝরিণী দেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, আশালতা সেন, কুমুদিনী মিত্র, বনলতা সেন প্রমুখ নারী স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সমসাময়িক *বামাবোধিনী পত্রিকা* ও *অন্তঃপুর পত্রিকা* সহ নানা পত্র-পত্রিকা স্বদেশি ভাবধারায় মেয়েদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। মূলত বাংলার মেয়েদের স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রমাণ করে তারা শুধু ঘরের কাজ নয় বাইরের জগতের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে পাশ্চাত্যের অগ্রসরমাণ নারীর মতো দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম।[২৯] অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সিস্টার নিবেদিতা বারোদা নামক স্থানে অরবিন্দ ঘোষের সাথে পরিচিত হয়ে ইংরেজ অধীনতা থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা উভয়েই সরলাদেবীর 'গুপ্ত সমিতি'তে যোগ দেন। নিবেদিতা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রবন্ধ রচনা করে ইংরেজ-বিদ্বেষ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে থাকেন।[৩০]

১৯০৫ সালে বিপিনচন্দ্র পাল 'স্বদেশি মণ্ডলী' নামক একটি চরমপন্থী দল গঠন করেন। এ দলে পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় শহর ও গ্রামে মেয়েরা দেয়াশলাই, সাবান, কাগজ, কালি, চরকার সুতা প্রভৃতি স্বদেশি পণ্য উৎপাদনের জোয়ার সৃষ্টি করেন। ১৯০৬ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় *যুগান্তর* পত্রিকায় এবং *বন্দে মাতরম* পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ ও কতিপয় নারী স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক লেখা প্রকাশ করেন।[৩১] তৎকালে সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে যারা স্বদেশি আন্দোলনে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন তার মধ্যে অন্যতম চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। মুকুন্দ দাস গেয়েছেন-

ও আমার বঙ্গনারী
পরো না বিলেতী শাড়ী
ভেঙ্গে ফেলো বেলোয়ারী চুড়ি।[৩২]

তখন মেয়েরা মঞ্চে উঠে চুড়ি ভেঙ্গে ফেলার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। আবার তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' এবং 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গেয়ে সকলকে আলোড়িত করতেন।[৩৩] এসময় কাজী নজরুল ইসলামের 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানের আহ্বানেও নারী-সমাজ জেগে ওঠেন।[৩৪] মুকুন্দ দাস মেয়েদের সহায়তায় একটি যাত্রাদল গঠন করেন এবং যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় যাত্রাপালার আয়োজন করে স্বদেশি বার্তা প্রত্যন্ত গ্রামের নারী-পুরুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। অন্যদিকে মনোমোহন চক্রবর্তীর 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী, কভু হাতে পরো না, জাগো ওগো মা ভগিনী, মোহের ঘোরে আর থেকো না' গানটি বাঙালি নারীর মধ্যে স্বদেশি চেতনা উজ্জীবিত করতো।[৩৫] এ সময় জাতীয় নেতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, নিবারণচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা তাদের সম্মোহনী ভাষণের মাধ্যমে নারীকে স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। এভাবে কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন ধারার ব্যক্তিবর্গ বিলেতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশি পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে নারী-সমাজকে উৎসাহিত করেন। কেননা মেয়েরা ছিলেন ঘরের কাজের প্রধান চালিকাশক্তি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসপত্র নারীর হাতেই গৃহ পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হতো। তাই স্বদেশি ভাবধারার মেয়েদের সচেতন করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।

স্বদেশি আন্দোলনে যে সকল নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র। তিনি নারীসমাজকে আহ্বান জানান পুরুষের সাথে একযোগে স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করার জন্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি মেয়েদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে অতীতের পূণ্যবতী নারীর কথা স্মরণ করেন যারা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মুখ যুদ্ধে স্বামী-পুত্রকে প্রেরণ করেছেন, এমনকি নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন।[৩৬] স্বদেশি আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ অনেকটা কম

ছিল। মুসলিম মেয়েরা এ সময় শিক্ষায় যেমন পিছিয়ে ছিলেন, তেমনি রাজনৈতিকভাবে তারা খুব একটা সচেতন ছিলেন না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভূমিকা পালন করেন পূর্ববাংলার খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৮০-১৯১২)। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গের আগেই ১৯০৫ সালে *নবনূর* পত্রিকায় "স্বদেশানুরাগ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে,

> ভগ্নিগণ আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশি শাড়ী পরিত্যাগ করি, বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ঘৃণার চোখে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী-সু পায়ে দিয়ে হুচ্‌ট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের উপকার করিতে পারিব। ... আমরা নির্ব্বোধ না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আমাদিগকে সামান্য জার্মান সিলভারের গহনা ও বেলোয়ারী চুড়ি দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে।[৩৭]

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নারী খায়রুন্নেসা নিজ বক্তব্য লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি স্বদেশি ভাবধারায় মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে বলেন- বোম্বাই, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে নানারকম ধুতি ও রেশমী শাড়ি এবং চিকন কাপড় প্রস্তুত হয়। এ সকল বস্ত্র ব্যবহার করলে দেশের টাকা দেশেই থেকে যাবে, নিজ দেশের শিল্পের প্রসার ঘটবে, গরীব শ্রমজীবী তাঁতীরা অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারবে। উল্লেখ্য প্রথমাবস্থায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে মুসলমানরা অংশগ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করলেও খায়রুন্নেসার স্বদেশি ভাবধারা মুসলমানদের এ আন্দোলনে আকৃষ্ট করে। মুসলমানদের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, টাঙ্গাইলের জমিদার এবং কলকাতার খ্যাতনামা আইনজীবী আব্দুল হালিম গজনভী, বর্ধমানের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা আবুল কাসেম, *দি মুসলমান* পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং পূর্ব বাংলার সিরাজগঞ্জের কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজীসহ অনেকে স্বদেশি আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে যোগদান করেন।[৩৮] তবে তারা হিন্দুদের মতো মুসলিম নারীকে এ আন্দোলনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেননি।

ব্রিটিশদের Divide and Rule নীতির ফলে বাঙালি জাতি তথা ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে- তৎকালে এ বিষয়টি উপলব্ধি করে যারা বিচলিত ছিলেন তাদের মধ্যে খায়রুন্নেসা অন্যতম। একজন নারী হিসেবে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল যুগের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর। 'শিখাগোষ্ঠী' প্রায় দেড় যুগ আগে প্রত্যন্ত গ্রামের একজন নারী খায়রুন্নেসা 'খয়ের খাহ্ মুনসী' ছদ্মনামে একাধিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন।[৩৯] তিনি শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেন,

> ইংরাজ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও সময় সময় রাষ্ট্রীয় মন্তব্যের প্রচার করিয়া এদেশীয় শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে আকাঙ্খা উদ্দীপিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। ইহাতে চারিদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ...কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। এ জন্যই দেখা যাইতেছে যে, আজকাল হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।[৪০]

অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী খায়রুন্নেসা খাতুন দেশি শিল্পের পুনরুজ্জীবন করতে সকলকে উৎসাহিত করেন। বিদেশি কৌটার গুড়া দুধের পরিবর্তে দেশি গরুর দুধ, বিদেশি চিনির পরিবর্তে দেশি আখের চিনি ও খেজুরের গুড় খাওয়ার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। আবার বিদেশি চুরুট ও সিগারেটের বিষাক্ত নেশা ত্যাগ করার জন্য পুরুষ সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি স্বদেশি পণ্য গ্রহণে নারীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আশাকরি তোমরা প্রত্যেকেই প্রাণপণে স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। তোমরা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকলে এই দরিদ্র ভারতের আর কোন উপায় নেই। এখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গার সময় হয়েছে।"[৪১]

স্বদেশি আন্দোলন সফল করার জন্য বাঙালি মেয়েরা কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে এমনকি বিক্রমপুর, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে শতাধিক নারী অংশগ্রহণ করেছেন। পুরুষ কর্তৃক আয়োজিত সভায় নারী অংশগ্রহণ করতেন, আবার অনেকসময় এ ধরনের অনেক সভা মেয়েরা নিজেরাই আয়োজন করত বলে সমসাময়িক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায়।[৪২] মানিকগঞ্জের বয়রাতে সুশীলাসুন্দরী গুপ্তা এক সভায় নেতৃত্ব দেন। আবার খুলনায় স্নেহশীলা চৌধুরীর নেতৃত্বে এরূপ সভার আয়োজন করা হয়।[৪৩] পুরুষের প্রকাশ্য সভার মঞ্চে নারী আসন গ্রহণ করতেন, আবার অনেক সময় মূল মঞ্চের সাথে পর্দাঘেরা ছাউনিতে তারা বসতেন।[৪৪] পুরুষ কর্তৃক আয়োজিত সভায় অনেক সময় মেয়েরাও বক্তৃতা করতেন। বরিশালের সভায় অশ্বিনীকুমার দত্ত, বাবু নিবারণচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুহ সম্মোহনী বক্তৃতা করতেন। সে সময় পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে স্থানীয় জমিদার উপেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু চিন্তাহরণ মজুমদারের অনুমোদনে এরূপ একটি স্বদেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বদেশানুরাগী জমিদার শ্যামলাল পাল চৌধুরী। এখানে 'বন্দে মাতরাম' ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং স্থানীয় অনেক নারী এতে অংশগ্রহণ করেন।[৪৫] ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত একটি স্বদেশি সভায় অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অবসর সময়ে বিশেষ করে হিন্দু বিধবারা চরকায় সুতা কেটে, বস্ত্রবয়ন যন্ত্রে কাপড় বুনে এবং সে-কাপড় কেটে সেলাই করে পরিবারের প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।[৪৬]

১৯০৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকার গেন্ডারিয়ায় দীননাথ সেনের বাসভবনে মেয়েদের একটি স্বদেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বলা হয়, 'বঙ্গীয় নারী সকলই সহিয়া লইতে এবং মনে করিলে সকলই করিতে পারেন।'[৪৭] এ উক্তি উচ্চারণ করে নারীসমাজকে স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলে। এভাবে পূর্ববাংলার ফরিদপুর, মাদারীপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক হারে মেয়েদের স্বদেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যা সমসাময়িক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা নিয়মিতভাবে খবর প্রকাশ করে। উল্লেখ্য তখন স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েরা নানারকম নিপীড়নের শিকার হন- এ তথ্যও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশে যে সকল নারী ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সভা সমিতি করে মেয়েদের স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকজনের নাম কমলা দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

যথা-

১. মুক্তকেশী দেবী (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রুমাতা)
২. সুশীলাসুন্দরী সেন (ঢাকার দীননাথ সেনের কন্যা)
৩. চিন্ময়ী দাস – সোনারং গ্রাম
৪. নবশশী দেবী " "
৫. সুশীলা সেন " "
৬. কমলকামিনী গুপ্তা – আউটসাহী গ্রাম
৭. প্রিয়বালা গুপ্তা " "
৮. গিরিজা গুপ্তা " "
৯. সুরমা সেন " "

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে বাংলার নানা জায়গায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন শুরু হয়। এ সময় ঢাকার মুন্সিগঞ্জে ক্যাপসুল (ওষুধ), বরিশালের উজিরপুর, রহমতপুর ও কীর্তিপাশা গ্রামে কলমের নিব তৈরি হয়। কলকাতার দি গ্রেট ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি সিমেন্ট ও পেইন্টার রং উৎপাদন শুরু

করে।[৪৯] আবার বাঙালি মেয়েরা চরকায় সুতা কেটেছেন। উল্লেখ্য কলকাতায় চরকার ব্যাপক প্রচলন হয়। অন্যদিকে বিক্রমপুরের নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলকামিনী গুপ্তা প্রমুখ নারী একত্রিত হয়ে একটি মহিলা সমিতি গঠন করে ২৪টি চরকা কিনে সুতা প্রস্তুতের জন্য গ্রামের নারীর মধ্যে বিতরণ করেন।[৫০] পূর্ব বাংলার মানিকগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, রাজবাড়ী, বিক্রমপুর প্রভৃতি জায়গায় চরকার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। উল্লেখ্য ১৯০৬ সালে 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পাশ্রম' নামে পুনরায় সক্রিয় হয়।[৫১] এখানে বিধবা মেয়েদের সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, কলের মোজা, গেঞ্জি, লেস, কাপড় কাটা, পোশাক তৈরি, মোমবাতি তৈরি এবং চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। গৃহে তৈরি দ্রব্যের প্রদর্শনীর জন্য শিল্পমেলারও আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে বহুসংখ্যক বাঙালি নারী নিজেদের জমানো সীমিত অর্থ এবং অলংকার দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন পরিচালনায় তহবিল সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'তে (স্বদেশি আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত) অনেক নারী অর্থ ও অলংকার প্রদান করেন। এ সমিতিতে বরিশালের হেমনলিনী গুপ্তা তার চাচাতো বোনের বিয়েতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শয্যা তোলনী বাবদ প্রাপ্ত ৩ টাকা জমা দেন। বরিশালের আরেকজন নারী সরোজিনী বসু নিজের হাতের স্বর্ণের বালা স্বদেশি ভাণ্ডারে জমাদানের জন্য অশ্বিনী কুমারের কাছে প্রেরণ করেন। স্বদেশি আন্দোলনে দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর অবদান রাখার জন্য পরবর্তী কালে ১৯০৮ সালে সরোজিনী বসু 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধিতে ভূষিত হন।[৫২]

এছাড়া বরিশালের স্বল্পবয়সী গৃহবধূ মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) হাতের কব্জিতে হলুদ রং এর সুতার রাখি বেঁধে স্বদেশি আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সারাটি জীবন মনোরমা বসু বাংলার রাজনীতির সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন। ১৭ বছর বয়সী গৃহবধূ লাবণ্যপ্রভা দত্ত (১৮৮৮-১৯৭১) তাঁর পরিবারকে বিদেশি পণ্য বর্জন এবং স্বামী যতীন্দ্রনাথ দত্তকে স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। বরিশালের অন্য একজন নারী কুসুমকুমারী দাসী স্থানীয় মেয়েদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সচেতনতার প্রয়াসে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নিজেই এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।[৫৩] আবার ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীমতি দীনমনি চৌধুরী তাঁর প্রজাদের স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেন।[৫৪] অন্যদিকে তখন অভিজাত পরিবারের বাঙালি নারীসমাজ বিদেশি বস্ত্র বর্জন করে স্বদেশি তাঁতের ও খাদি শাড়ি পরা শুরু করে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে সমর্থন জানান। এ প্রসঙ্গে আশালতা সেন বলেন-

> বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেশের লোকের মনে একটা বৈপ্লবিক ভাবধারা এনে দিয়েছিল। প্রাচীন পন্থী পর্দানশিন মহিলারা পর্যন্ত বিদেশি জিনিস বয়কটের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। আমার মাতামহী নবশশী দেবী আমাকে পাড়ার গৃহবধূদের কাছে পাঠালেন 'বিদেশি বর্জন আর স্বদেশি ব্যবহারের' প্রতিজ্ঞা পত্রে সই করাতে। ... তিনি আমাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজপুত, মারাঠা আর শিখদের লড়াইয়ের ইতিহাস আর বাংলার প্রতাপাদিত্য, মনিপুরের টিকেন্দ্রজিৎ, ইতালির গ্যারিবল্ডির জীবনী জাতীয় অনেক বিপ্লবাত্মক বই পড়তে দিতেন। দেশের স্বাধীনতা কি করে আনা যায়- এই কথা প্রায়ই ভাবতাম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' আর স্বামী বিবেকানন্দের লেখা খুব আগ্রহ ভরে পড়তাম।[৫৫]

আশালতা সেন স্বদেশি আন্দোলনে বাঙালি নারীকে উজ্জীবিত করার জন্য বিপ্লবাত্মক বিভিন্ন কবিতা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবনচরিত এবং সাবিত্রীর কাহিনি রচনা করেন।[৫৬] এছাড়া বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে হাওড়া জেলার ননীবালা দেবী, বীরভূমের দুকড়িবালা দেবী, ময়মনসিংহের ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী, বরিশালের হেমনলিনী গুপ্তা, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, কুসুম কুমারী দাসী, পাবনার বিন্দুবাসিনী দেবী, মুসলিম নারী জোবেদা খাতুন চৌধুরী, শামসুন নাহার মাহমুদ, ময়মনসিংহের রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সামসুন্নেসা বেগম, রওশন আরা বেগম, রাইজু বানু বেগম, বদরুন্নেসা বেগম প্রমুখ নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগদান করেন। সুশীল সমাজের নারী ছাড়াও বারবনিতা নারীও এসময় বিদেশি

পণ্য বর্জন ও স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার ও স্বদেশি ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করেন বলে জানা যায়।[৫৭] এভাবে স্বদেশি আন্দোলনে সকল শ্রেণির নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

মূলত স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাঙালি নারীর সাহসিকতার বৃদ্ধি ঘটে। তাই এরপর সহিংস আন্দোলনে তাদেরকে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেখা যায়। ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস সুরাটে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ বছরই *যুগান্তর* পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী লেখার জন্য ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর কারাদণ্ড হয়। আবার অরবিন্দ ঘোষ ও সিস্টার নিবেদিতার উপর এসময় পুলিশের কড়া নজরদারী লক্ষ করা যায়। তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আসে। এ সময় ট্রেন লাইনে বোমা হামলা, তদানীন্তন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে (১৯০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর) গুলি করা, চন্দননগরের মেয়রের উপর বোমাহামলা প্রভৃতি চলতে থাকে। যা ছিল স্বদেশি আন্দোলনের নামে স্বাধীনতা আন্দোলনের নামান্তর মাত্র। তখন সিস্টার নিবেদিতা প্রত্যক্ষভাবে এসব কাজে যোগ দেন এবং আরও অনেক নারী অন্তরালে থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন। ১৯০৮ সালে মজফ্ফর পুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের উপর বোমা মারতে গিয়ে ভুলবশত ইংরেজ নারী মিসেস কেনেডি ও তার কন্যাকে নিহত করার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। উল্লেখ্য এ হামলায় প্রফুল্ল চাকী অংশ নিলেও গ্রেপ্তার এড়াতে নিজ গুলিতে তিনি আত্মাহুতি দেন। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বাঙালি নারীর মধ্যে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য হাওড়া জেলার বালিতে জন্মগ্রহণকারী নারী ননীবালা দেবী (১৮৮৭-১৯৬৭)। ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি অস্ত্র চালনার দীক্ষা নেন। ১৯১৫ সালে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে ননীবালা দেবী তার নকল স্ত্রী সেজে রামচন্দ্রের সাথে জেলখানায় দেখা করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের সাথে ননীবালা দেবী একযোগে কাজ করেন। অবশ্য তিনি এসব কাজের জন্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং তিনিই বাংলার প্রথম নারী রাজবন্দী।[৫৮] এ পর্যায়ে আরেকজন নারী বীরভূমের ঝাউপাড়া গ্রামের দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭-১৯৭০)। তিনিও ভাগ্নে নিবারণ ঘটকের বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হন। ভাগ্নে সাতটি পিস্তল দুকড়িবালা দেবীর ঘরে লুকিয়ে রাখলে পুলিশ তাঁর বাড়ি তল্লাসি করে এবং অস্ত্র পেয়ে দুকড়িবালাকে বন্দী করে জেলখানায় নেওয়া হয় (১৯১৭)।[৫৯] ক্ষিতিশ চৌধুরী ও বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের 'যুগান্তর' দলের সদস্য হন ময়মনসিংহের ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী (জন্ম ১৮৮৩)। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে দক্ষতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হন। এভাবে বাংলার নারী স্বদেশি আন্দোলনের পথ ধরে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। যা এ আন্দোলনের চূড়ান্ত সফলতা। তবে এরপরও বাঙালিদের অন্তরে ও কার্যক্রমে স্বদেশি ভাবধারা বলবৎ থাকে।

গুরুত্ব

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে বাংলার পুরুষসমাজ মেয়েদের আহ্বান জানান, কারণ তারা ভেবেছিলেন তাদের একার পক্ষে সফল হওয়া সম্ভবপর হবে না। তারা ধারণা করেছিলেন, নারীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন সফল করা সম্ভব। তাই তারা নারীর জন্য অংশগ্রহণের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দেন। অর্থাৎ এ আন্দোলনে পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত কর্মসূচী মেয়েদের পালন করতে হয়। মূলত আন্দোলনটি সফল করার জন্য পুরুষসমাজ নারীকে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা ভালোভাবে উপলব্ধি করেন মেয়েরা গৃহপরিমণ্ডলে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে। তাই বিদেশি পণ্য বর্জন এবং দেশি পণ্যের ব্যবহারে নারী সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে পরিবারের পুরুষ সদস্য তথা স্বামী, পুত্র ও ভাইকে মেয়েরা এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কাজটিও করতে পারে। মূলত এসকল বিষয় মাথায় রেখে পুরুষসমাজ নারীকে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শক্তিশালী পুরুষের আহ্বানে আবেগী হয়ে মেয়েরা জাতীয় দুর্যোগের দিনে স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। তারা অবরুদ্ধ জীবন থেকে খানিকটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করেন। জাতীয় নেতারা নারীকে দেবীতুল্য করায় তারা সম্মান বোধ করেন। তাই বাঙালি নারী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকে পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন। নারীসমাজ ঘরের পুরুষকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রেরণ করতে অনুপ্রাণিত হন এবং নিজেরা সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় নেতারা বন্দী হলে তাদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। অন্যদিকে আন্দোলন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহে মুষ্টি অন্ন সঞ্চয় এবং নিজের গায়ের গহনা খুলে জাতীয় ভাণ্ডারে প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রিকায় তারা লেখনীর মাধ্যমে স্বদেশের গুণকীর্তন করতে থাকেন। সে সময় গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী *স্বদেশিনী* নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সরলাবালা সরকার *সাহিত্য* পত্রিকায় 'স্বদেশসেবায় বঙ্গরমণী' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন। এভাবে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত নারীর মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা জাগ্রত হয়। অন্যদিকে তারা সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করে পুলিশের নির্যাতন মাথা পেতে নিয়েছেন। মূলত স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সমাজে নারীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, তাদের কর্মদক্ষতার বলিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। পুরুষের সাথে আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় সমাজে অবরোধপ্রথার শিথিলতা আসে। ঘরের কাজের পাশাপাশি নারী যে অন্যান্য কাজও করতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে মেয়েদের নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন আসে। নারী-পুরুষ একসাথে একটি কাজ করলে দ্বিগুণ শক্তিতে সে কাজটি করা যায় এসময় সেটি দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার নারীসমাজ সীমিত পরিসরে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শুরু করেন এবং তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণও করতে থাকেন। *ভারতী*, *অন্তঃপুর*, *ঢাকা প্রকাশ*, *ভারত মহিলা*, *জাহ্নবী*, *বামাবোধিনী*, *নবশক্তি*, *সঞ্জিবনী*, *বঙ্গবাসী* প্রভৃতি পত্রিকা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করে এবং সম্পাদকীয়তে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণে নারীকে উৎসাহিত করে। তখন *সুপ্রভাত* ও *অন্তঃপুর* পত্রিকার পাতায় স্বদেশি দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো। অন্যদিকে এ সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। জাতীয় নেতাদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের নারীর গৌরবোজ্জল ভূমিকার পুনপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা শুরু হয়। নারীকে মাতৃরূপী দেবী হিসেবে তার শক্তির পূজা করার প্রবণতা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠ* উপন্যাসে দুর্গা-কালীরূপে নারীশক্তির সাথে ভারতমাতার তুলনা করেন এবং নারীশক্তির পূজা করার একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরম' (মাতৃভূমির বন্দনা করো) ধ্বনিটি পরবর্তীতে স্বদেশি আন্দোলনে জনগণকে উজ্জীবিত করতে ব্যাপকভাবে ব্যাবহার করা হয়। অন্যদিকে তখন বিভিন্ন সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়েরা নিজেদের সংগঠিত করতে থাকেন। তবে হিন্দু নারীর তুলনায় মুসলিম নারী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে কম সংখ্যক অংশগ্রহণ করেন। কেননা সমসাময়িক সময়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক মুসলিম নারী জাগরণী কাজ শুরু হলেও জাতীয়তাবোধ তথা রাজনৈতিক চেতনায় মুসলিম মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার মতো পরিবেশ তখনও সৃষ্টি হয়নি। তবে সার্বিকভাবে রক্ষণশীল পরিবেশের পরিমণ্ডল নারীকে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে পরোক্ষ ভূমিকায় রাখে। তারপরও বাঙালি নারীসমাজ এ আন্দোলন সফল করে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনটির সফলতায় নারীর আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তারা সাহসী হয়ে ওঠেন। ফলে পরবর্তীকালে সংঘটিত জাতীয় আন্দোলনগুলিতে বাঙালি নারী উত্তরোত্তর বলিষ্ঠতা দেখাতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে মেয়েদের দুঃসাহসিক অংশগ্রহণ বাংলায় নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনকে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. 'স্বদেশি' শব্দের অর্থ নিজ দেশীয়। বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশি আন্দোলনের যুগে 'স্বদেশি' অর্থ ব্রিটিশ জিনিসপত্র ও চিন্তাধারার বদলে দেশীয় পণ্য ও চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার নীতি বা আদর্শকে বুঝায়। যার অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার ও প্রসার। এভাবে দেশীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা এবং স্বদেশি মৃতপ্রায় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য ভারতবর্ষে আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদসাধন করা। অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা।

২. 'বয়কট' শব্দের অর্থ বর্জন করা। বিশ শতকের প্রারম্ভে বয়কট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা তথা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের দ্বারা ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর আঘাত হানা। শুধু বিলেতি বস্ত্র বা পণ্যসামগ্রী নয়, ব্রিটিশ চিন্তাধারা, আইনসভা, শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, আদালত প্রভৃতি সবকিছু বয়কটের মাধ্যমে বর্জন করার আদর্শ প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন ভারতবর্ষে একযোগে শুরু হয়েছিল।

৩. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা : দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ৮১

৪. অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ২৪

৫. ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *মুঘল ভারতের ইতিহাস* (ঢাকা : ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ৪৭১

৬. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃ. ১০৩

৭. ১৭৯৮-৯৯ খ্রি. বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে একটি আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহটি *চোয়াড় বিদ্রোহ* নামে পরিচিত। মুলত চোয়াড় শব্দটি দ্বারা বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের আদিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এ অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং এখানে চোয়াড় সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতো। অতীতে এমনকি মুঘল নবাবি আমলেও কোন শাসকই চোয়াড়দের স্বাধীন জীবনযাপনে হস্তক্ষেপ করেনি। অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং আদিম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এ অঞ্চলের উপর ইংরেজ সরকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে চোয়াড় সম্প্রদায়ের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে থাকে। (*তদেব*, পৃ. ১৩২)

৮. অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

৯. *তদেব।*

১০. ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণে অযোধ্যার শাসক নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ লক্ষ্মৌ শহর ত্যাগ করলে তাঁর স্ত্রী হজরত মহল ১১ বছর বয়স্ক পুত্র বিরজিস কাদিরকে অযোধ্যার নবাব ঘোষণা করেন। সে সময় হজরত মহলের জ্বালাময়ী ভাষণের সম্মোহনী শক্তিতে অযোধ্যার জনগণ বিরজিস কাদিরকে নবাব হিসেবে মেনে নেয়। স্বামীর অবর্তমানে হজরত মহল নাবালক পুত্রের অভিভাবক হয়ে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার কেলিন ক্যাম্পবেলের ৩১ হাজার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সমরে অংশগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত হজরত মহলের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তথাপি একজন মুসলিম নারীর এ বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক যুদ্ধের বিষয়টি ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। Manmohan Kaur, *Women in India's Freedom Struggle* (New Delhi : Sterling Publishers, 1992), p. 36.

১১. Kanak Mukherjee, *Women's Emancipation Movement in India* (New Delhi : National Book Centre, 1989), p. 44; আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১* (কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ১৮৬

১২. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* (ঢাকা : দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ৯৬

১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, জুলাই ২২, ১৯৩৪, পৃ. ৩ (১৫ সংখ্যা ৭৪ ভাগ) (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের রিপ্রোগ্রাফী শাখা)

১৪. আরিফা সুলতানা, "বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি নারী", *অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসহাক ফান্ড বক্তৃতা ২০১৬* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ৪ অক্টোবর ২০১৬), পৃ. ৩

১৫. *তদেব।*

১৬. বাংলার বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ভূঁইয়া ছিলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। সরলাদেবী বীরযোদ্ধা প্রতাপাদিত্যের নামে একটি মঞ্চ তৈরি করেন। এখানে একটি তরবারি রেখে ঐ তরবারিতে প্রতাপাদিত্যকে স্মরণ করে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হতো। এভাবে দেশীয়দের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হতো।

১৭. সরলাদেবী ভারতীয়দের উৎসাহিত করেছেন যে, ইংরেজ সৈন্যদের হাতে কেউ অপমানিত হলে বিচারের জন্য অপেক্ষা না করে সাথে সাথে নিজেদের মতো করে প্রতিকার করতে হবে। যারা তৎকালে এরূপ প্রতিকার করে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতো তাদের বীরত্বের কাহিনী *ভারতী পত্রিকায়* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হতো। এসময় পাঠকমণ্ডলীর অনেকে এ বিষয়ে সরলাদেবীকে ধন্যবাদ জানাতে দেখা করতে আসতেন। এদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নিয়ে তিনি একটি *অন্তরঙ্গ দল* গঠন করেন। সরলাদেবী এ দলের সদস্যদের সামনে ভারতের মানচিত্র রেখে শপথ করিয়ে প্রত্যেক জনের হাতে একটি করে রাখি বেঁধে দিতেন। এ রাখি ছিল মাতৃভূমির জন্য যেকোন প্রতিরোধ বা যুদ্ধ মাথা পেতে নেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর পর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের দিনে এ রাখিবন্ধন নতুনরূপে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তারিত দেখুন: কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ৩১

১৮. *তদেব*, পৃ. ৩২

১৯. Bharati Roy, "Swadeshi Movement and Women's Awakening in Bengal 1903-1910", *Calcutta Historical Journal,* Vol. X, N. 2, 1985; *ভারতী*, কার্তিক, ১৩১১।

২০. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

২১. *Terrorism in Bengal,* (A Collection of Documents, Vol. 1-4, Compiled and Edited by Amiya K. Samanta, Director, Intelligence Branch, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1995), Vol. II, p. 808; উদ্ধৃত, আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

২২. রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী ১৯০৫-১৯৪৭* (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশ্‌স লিমিটেড, ২০১৬), পৃ. ১০৩

২৩. আশালতা সেন, *সেকালের কথা* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ১১

২৪. আরিফা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

২৫. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদের জোমাকান্দীতে নিজ বাসভবনে স্থানীয় নারীদের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কন্যা গিরিজাদেবী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' উপস্থিত পাঁচ শতাধিক নারীর মধ্যে পাঠ করেন। এ পুস্তিকার মূল কথা ছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে দেবী লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং শুধু লক্ষ্মীতুল্য বাঙালি নারীই পারে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে তাকে ধরে রাখতে। (আরিফা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫)

২৬. শ্রী সরযুবালা দত্ত সম্পাদিত, *ভারত মহিলা*, সচিত্র মাসিক পত্রিকা, প্রথম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১২, কলকাতা ; উদ্ধৃত, রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬

২৭. *তদেব*, পৃ. ১০৭

২৮. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal* (New Delhi : Peoples Publishing House, 1977), p. 288.

২৯. Aparna Basu, "*The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom",* in Indian Women : From Purdah to Modernity, B.R. Nanda (ed.), (New Delhi : Vikas Publishing, 1976), p. 17.

৩০. কমলা দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩

৩১. *তদেব*, পৃ. ১৪

৩২. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

৩৩. *তদেব*, পৃ. ৮৩

৩৪. *তদেব।*

৩৫. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশি গান* (কলকাতা : নয়া প্রকাশ, ১৯৮৩), পৃ. ১০

৩৬. কুমুদিনী মিত্র, *"মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে মহিলাগণের কর্তব্য"*, *ভারত মহিলা*, ভাদ্র ১৩১২, পৃ. ১২-১৫; উদ্ধৃত, আরিফা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৩৭. খায়রুন্নেসা খাতুন, "স্বদেশানুরাগ", *নবনূর*, তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ) সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১২, পৃ. ২১

৩৮. Prodip Kumar Lahiri, *Bengali Muslim Thought, 1818-1947* (Calcutta : K.P Bagchi, 1984), pp. 246-282.

৩৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৭

৪০. খায়রুন্নেসা খাতুন, "রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান", *নবনূর*, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১২।

৪১. খায়রুন্নেসা খাতুন, "স্বদেশানুরাগ", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

৪২. *ঢাকা প্রকাশ*, আগস্ট ১৩, ১৯০৫, পৃ. ৩

৪৩. আরিফা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৪৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১), পৃ. ১৪৩

৪৫. *ঢাকা প্রকাশ*, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯০৫, পৃ. ৫

৪৬. *ঢাকা প্রকাশ*, সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯০৫, পৃ. ৮

৪৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ডিসেম্বর ২৪, ১৯০৫, পৃ. ৩

৪৮. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ২৭২

৪৯. *ঢাকা প্রকাশ*, সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯০৫, পৃ. ৯

৫০. আরিফা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৫১. যোগেশচন্দ্র বাগল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৫২. আরিফা সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, ১৪

৫৩. *তদেব*।

৫৪. *তদেব*।

৫৫. আশালতা সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৫৬. *তদেব*, পৃ. ১৭

৫৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৫৮. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

৫৯. *তদেব*।